JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

মধ্যযুগের বাঙালির ব্যবসা ও বাণিজ্য

Zokey Ahad
PhD Scholar
Assam University

আহমদ শরীফ তাঁর 'বাঙালি ও বাংলা সাহিত্য' (প্রথম খন্ড) গ্রন্থে প্রাসঙ্গিক বলেছেন: 'নিষাদ, কোল, ভীল, মুন্ডা, সাঁওতাল শবর, পুলিন্দ, মালপাহাড়ি হচ্ছে অপেক্ষাকৃত স্বল্প শংকর আদি অস্ট্রেলীয় বা ভেড্ডিড। আর কিরাত, রাজবংশী, নাগা, কোচ, মেচ, মিজ্জার, কুকী, চাকমা, আরাকানী প্রভৃতি হচ্ছে স্বল্প শংকর মোঙ্গলীয়। তাছাড়া ২৪ পরগনার বেড়াচম্পার ও হরিনন্দনপুর বা হরিনারায়ণপুর কালপ্রবাহে গৌড়, মানব, চৌড়, শক, হূন, কুলিক, কর্ণাট, লাউ, (মনহলি পস্তোলি - মদন পাল দেব) দ্রাবিড়, মুরুন্ড্রা, কৃষাণ, ইউচি, আরব, ইরানী, হবিসী, গ্রিক, তুর্কি, আফগান, মোগল, পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ-রক্ত মিশ্রিত হয়েছে। এই মিশ্র শংকর বাঙালি জাতির মানুষেরা যেখানে বসবাস করতেন, সেই বাংলার পরিসর ছিল পুন্ড্রা, রাঢ়, বঙ্গ, সুরমার ভৌগোলিক সীমানার অন্তর্গত।

বাংলা ও বাঙালির শাস্ত্র, সংস্কৃতি, সভ্যতা এবং রীতিনীতি সবটাই বিদেশি, বিজাতি ও বিধর্মী থেকে পাওয়া গেলেও বাঙালি জাতিসত্তা তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্য হারায়নি। ধর্মগত জাতিপরিচয়ে জৈন-বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য মত এবং ইসলাম গ্রহণ করলেও বাঙালি ও বাংলা তার আদিম ধর্মসংস্কার পরিহার করেনি। এমনকি বহুকাল ইংরেজ শাসনে থাকার পরেও বাঙালি তার অস্তিত্ব হারায়নি। ইংরেজ যেমন এদেশে এসে নিজেদের ব্যবসার ভীত শক্ত করে গড়তে চেয়েছে তেমনি বাঙালি জাতিকেও ব্যবসা শিখিয়েছে। ইংরেজ যেমন বাংলাদেশ থেকে প্রচুর রাজস্ব সংগ্রহ করে নিয়ে গেছে তেমনি বাংলাদেশের দুর্দশার সময়ে তাদের দেশের উৎপাদিত দ্রব্য অপেক্ষাকৃত কম দামে দিয়ে দেশকে টিকে থাকতে সাহায্য করেছে। হয়তো তাদের উদ্দেশ্যে স্বার্থপরতা ছিল কিন্তু কাজ এবং তার ফল খারাপ ছিল না। এদিকে ব্যবসার লোভে বাংলায় এসে আধিপত্য বিস্তার করতে চায় জার্মানরা।

আসলে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ভৌগলিক পালাবদলের কারণে বাংলাদেশ এমনই এক জায়গা হয়ে উঠেছে যেখানে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনজাতি এসে ব্যবসার ভীত স্থাপন করতে পেরেছে। সবাই এসেছে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করতে এবং চলেও গেছে লুন্ঠন বন্টন শেষ করে। এর মাঝখানে দেশীয় মানুষেরা যা করেছে তা-ই থেকে গেছে মূলত।

মধ্যযুগের বাংলার জনজীবন ছিল কৃষি নির্ভর এর সঙ্গে শ্রেণিদ্বন্দ্ব ছিল । তবে সেকালের অর্থনৈতিক জীবনে নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্তের বিশেষত জমিদারতন্ত্রের অবস্থান লক্ষ্য করার বিষয়। সেকালের সামন্ততান্ত্রিক কৃষি

অর্থনীতি পুঁজির সংগঠিত বিকাশের সাথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছিল। বাণিজ্যিক মূলধনের কোন অভাব ছিল না, তবু উৎপাদন প্রক্রিয়ায় কোন রূপান্তর ঘটেনি। লক্ষ্য করা গেছে যে, অর্থনৈতিক জীবনের ধারা অব্যাহত ছিল। এই সময়ের জীবন যেহেতু কৃষি নির্ভর ছিল সে কারণে নৌ-বাণিজ্যের মাধ্যমে কৃষি পণ্য দেশে ও বিদেশের বিভিন্ন স্থানে পরিবহন করা হতো। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য ও পুঁথি দু-ভাষী পুঁথি কিংবা রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলিতে বর্ণিত বাণিজ্যকথা থেকে লক্ষ্য করা গেছে যে— 'বাণিজ্যে বসতি লক্ষ্মী' সেকালে ও একালের এই আত্মবাক্য শিরোধার্য করে চাঁদ সদাগর, ধনপতি সদাগরের মতো বণিকেরা কোথাও সপ্তডিঙ্গা মধুকর, কোথাও বা চৌদ্দডিঙ্গা সাজিয়ে পাড়ি জমাতেন দক্ষিণ প্রান্তে। লক্ষ্য করা যায় যে মধ্যযুগে বাংলার বাণিজ্য বিশেষত অন্তর্দেশীয় বাণিজ্যে কি বহির্বাণিজ্যে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত বাঙালির একটি দৃঢ় জায়গা ছিল এবং একথা ঠিক যে সেকালের সাহিত্য থেকে বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে মঙ্গলকাব্য ও পুঁথি সাহিত্যে বিধৃত বাংলার সমাজ জীবন বিশেষত চারশত বছরের। এই চারশ বছরের ইতিহাসে দেখা যায় বাংলার অর্থনীতির মূল ভিত্তি হচ্ছে কৃষিজাত সামগ্রী।

মঙ্গলকাব্য থেকে জানা যায় যে তখন বিনিময় প্রথাও চলতো সরগরম। দেখা যায় যে বাইরে থেকে বাংলায় সোনা ও রূপার আমদানি হত কিন্তু সেটাও ব্যবসায়িক স্বার্থে অর্থাৎ সোনা রূপা নিয়ে এসে বাংলার টাকশাল থেকে মুদ্রা বানানো হত। তবে তার সংখ্যাও ছিল নিছকই কম। এই কারণেই প্রয়োজনীয় যাবতীয় জিনিসপত্র ক্রয় বিক্রয় করা হতো পণ্যের বিনিময়ে। শুধু সোনা-রূপা বা অন্যান্য বাজারজাত সামগ্রী নয়, মানুষকেও বিক্রি করা হতো প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রীর সাথে।

ভূটান এক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভূটানী ব্যবসায়ীরা বিভিন্ন জিনিস বিক্রির জন্য নিয়ে আসতো উত্তরবঙ্গের আশেপাশে। সেখানে এসে তারা স্থানীয় লোকেদের ভাষা বোঝার জন্য দোভাষীর সাহায্য নিতেন। এখানে উল্লেখযোগ্য কথা হলো এই দোভাষীরা ব্যবসায়ীদের সাহায্য করার কারণে উপহার স্বরূপ রাজার থেকে জমি বাড়ি ইত্যাদি জীবনধারণের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পেয়ে যেতেন। তাদের মূল কাজই ছিল ভূটানী ব্যবসায়ীদের ভাষাগত দিক থেকে সাহায্য করা, রাস্তাঘাট চিনিয়ে দেওয়া, প্রয়োজনে তাদের জিনিসপত্র পরিবহনে সাহায্য করা। ইতিহাস থেকে জানতে পারি এখনকার মতোই তখনও প্রচুর ব্যবসা বাণিজ্য চলতো বেআইনিভাবে। অর্থাৎ এই উৎপাদনের রাজস্ব সরকারের কাছে আসতো না ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হতো সরকার এবং এই হিসেব বহির্ভূত দ্রব্য বাজারেও সমস্যার সৃষ্টি করতো।

মধ্যযুগের বাংলার যোগাযোগ ব্যবস্থা মূলত নদী ও সমুদ্রকেন্দ্রিক। তৎকালে খাল-বিল-ডোবা-নালা-জঙ্গল-পাহাড় পরিবৃত্ত বঙ্গদেশের জীবনযাপন মোটেই সহজ ছিল না। একথা ঠিক যে মধ্যযুগের বঙ্গদেশের মঙ্গলকাব্যের সূচনা হয়েছিল সুলতানি আমলে এবং তার উজ্জ্বল বিস্তার ঘটে মোগল আমলে। এই ধারা অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। নদী ও সমুদ্রবেষ্টিত জীবন সেখানে অর্থনৈতিক জীবনের ভিত্তি রচনা করে দিয়েছিল। মঙ্গলকাব্যগুলিতে তাই বণিকের ছড়াছড়ি। চম্পক নগরাধিপতি চাঁদ সওদাগর, নিছনি নগরের সাহ বান্যা, উজানীনগরের ধনপতি দত্ত, বর্ধমানের ধুস দত্ত, সপ্ত গ্রামের রাম দাঁ, বরাবুলের হরিদত্ত, ফতেপুরের রাম কুণ্ড, কর্জনার হরিলা, ভালুকের লাখপতি সদাগর, ভাসেকের শ্রীধর হাজরা, দশঘড়ার কানু লাহা, বিষ্ণুপুরের হর্ষ দত্ত খাঁ, অজস্র বনিক। কবিকঙ্কন

মুকুন্দ চক্রবর্তী এইসব নৌ-বনিকদের তালিকা নির্মাণ করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। নৌ-বাণিজ্যে ব্যবহারের জন্য নানা ধরনের নৌকা ও জাহাজ বিদ্যমান ছিল। মঙ্গলকাব্যগুলিতে বিবৃত বাণিজ্য কথা থেকে দেখা গেছে যে সেকালের বাণিজ্য কেন্দ্রভূত ছিল বদল বাণিজ্যের। তবে সোনা ও রুপার যে বাণিজ্য চলতো তার পরিমাণ অবশ্য কম। মঙ্গলকাব্য বিশেষত 'চন্ডীমঙ্গল', 'মনসামঙ্গল' কিংবা 'বাসুলী মঙ্গল' কাব্যের প্রেক্ষিতে দেখা যায় চাল, তেল, ঘি, চিনি এবং শস্য সম্ভার নিয়ে জাহাজে ও নৌকাতে করে বাণিজ্য চলতো। তবে ইতিহাস থেকে জানা যায় সেই সময়ে রাস্তাঘাটও ছিল।

লবণের ক্ষেত্রেই নয় বিভিন্ন ব্যবসার ক্ষেত্রে ইংরেজদের স্বেচ্ছাচারী আচরণ বাঁধার তৈরি করেছে। নিয়মিত করের পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি নিয়মিত দায়িত্ব হাত বদল ইত্যাদি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে চাপের সৃষ্টি করে এবং তার সাথে মালিক ও শ্রমিক শ্রেণির ক্রমাগত মতানৈক্য, বাদ-প্রতিবাদ, হুমকি ইত্যাদি ব্যবসার উন্নতির পথে বাঁধার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তখন কলকাতা মুর্শিদাবাদ, হুগলি, বর্ধমান ও ঢাকার মধ্যে অনেক সড়ক পথ তৈরি হয়েছিল। সে সময় কলকাতা যোগাযোগ ব্যবস্থা এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। তবে কলকাতার মতো পূর্ব ও উত্তরবঙ্গের রাস্তাঘাট খুব একটা ভালো ছিল না অসংখ্য নদী-নালায় ঘিরে রাখা এই অঞ্চলের রাস্তাঘাট প্রায়ই খারাপ হয়ে পড়ে থাকত। বেশিরভাগ জায়গায় এই রাস্তাগুলো ভাঙ্গা এবং মাঝে মাঝে নালা থাকায় যোগাযোগের পথে বিঘ্ন ঘটাতো। মুর্শিদাবাদ থেকে তেলিয়াগড়ি হয়ে পাটনা পর্যন্ত রাস্তা ছিল। কলকাতা থেকে ছোট রাজপুর কোন্ডা ও পালামৌ বাজেট পর্যন্ত দু তিনটে রাস্তার সন্ধান পাওয়া যায়। তবে নদী পরিবহনের ক্ষেত্রে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র প্রশংসার দাবি রাখে। এই দুটো নদী পূর্ব ও উত্তরবঙ্গ কে বিভিন্ন সাগর-বন্দরের সাথে যুক্ত করে বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এগিয়ে দিয়েছে। বাংলাদেশ যেহেতু নদী প্রধান তাই সেখানে কিছু দূর পরে পরে নদীপথ মিলে যায়, কিন্তু সড়ক পথের দুর্দশা থাকায় সড়ক পথে যাতায়াত ততটাও সহজ ছিল না। এই দুটি নদীর বুক বেয়ে প্রায় এক কোটি মানুষের খাওয়া পড়ার জিনিস পরিবাহিত হতো। আমদানি রপ্তানি ছাড়াও দেশের আভ্যন্তরীণ শিল্প পণ্য কৃষি কর্মে উৎপন্ন ফসল কৃষিকর্মের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল মাছ ও অন্যান্য জিনিস এই নদী পথে চলাচল করতো। কলকাতা থেকে মূলত দুটি জলপথের সন্ধান পাওয়া যায় সেই সময়ের — একটি জলঙ্গি নদী হয়ে কোষের দিকে এবং আরেকটি ভাগীরথী হয়ে বিহার পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। দেশের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কলকাতা থেকে বিহারের এই নদীপথটি সর্বাধিক ব্যবহৃত হতো। বিহারের বিভিন্ন জিনিস এই পথেই কলকাতার বাজারে আসতো। তেমনি কলকাতা থেকে জলঙ্গী হয়ে পদ্মা পেরিয়ে পাবনা হয়ে ইছামতি নদীর উপর দিয়ে জাফরগঞ্জ যেতে হতো এবং তারপর জাফরগঞ্জ থেকে ধলেশ্বরী নদী হয়ে ঢাকা পৌঁছাতে হতো। ঢাকা থেকে সিলেট যেতে হলে বুড়িগঙ্গা, মেঘনা ও সুরমা নদী হয়ে যেতে হতো। আসলে পূর্ববঙ্গের বাজার হাটের সাথে নদীর সরাসরি যোগাযোগ ছিল। তৎকালীন বিদেশি বণিক ও পর্যটকেরাও এই নদীপথের প্রশংসা করেছেন। এই নদীগুলির গভীরতা যেমন বেশি ছিল তেমনি আয়তনেও বিশালাকার ছিল যাতে করে সহজেই বড় বড় পণ্যবাহী জাহাজ যাতায়াত করতে পারত। তাছাড়া এই নদীর তীরবর্তী প্রাকৃতিক পরিবেশ এত সুন্দর ছিল যে পর্যটকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। যে কোন দেশের রাস্তাঘাট যোগাযোগ ব্যবস্থা দেশের ব্যবসা বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক দিকে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। তাই দেখা যায় সেই সময়ে কলকাতার পাশাপাশি বর্ধমান জেলারও সুযোগ ছিল বাণিজ্যের মাধ্যমে উন্নীতকরণ করার। কারণ এই সময়ে

বর্ধমানের সাথেও নদীকেন্দ্রিক বাণিজ্য ব্যবস্থা ছিল, বর্ধমান হয়েই পুরীতে যেতে হতো। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের পরে দেশের অবস্থা কিছুটা অস্থির হয়ে পড়লে সব ক্ষেত্রেই এর প্রভাব পড়ে। বর্ধমান জেলায় নীল চাষ হত এবং নীলের কারখানাও ছিল। এদিকে তামা কাঁসার বাসনের জন্য বর্ধমান বিখ্যাত ছিল। কোম্পানির হাত ধরে বর্ধমানের যথেষ্ট পরিমাণে লবণ উৎপাদন হত। কিন্তু বাংলার নবাবদের জারি করা অতিরিক্ত শুল্কের জন্য বর্ধমানের বাণিজ্যিক পরিকাঠামো অনেকটা দুর্বল হয়ে পড়ে। করের পরিমাণ অত্যধিক বৃদ্ধি পেলে বর্ধমানের সকল উৎপাদনকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এর ফলে সমাজের প্রান্তিক স্তরে যেসব ছোট ছোট কৃষকেরা, বয়নশিল্পীরা কাজ করতেন, তারা অর্থনৈতিকভাবে একেবারে দুর্বল থেকে দুর্বলতর হয়ে পড়ে। তারপরে আবার মারাঠাদের আক্রমণে, বর্গী-হাঙ্গামা, বর্ধমানের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য আক্রান্ত হয়। অষ্টাদশ শতকে মোঘল সাম্রাজ্যের পতন ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার কারণে বর্ধমানের বাণিজ্য ব্যবস্থা আরো ব্যাহত হয়ে পড়ে এবং তারপরে যথারীতি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি তাদের একচেটিয়া ব্যবসা শুরু করে। ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে পারস্য ও ইরাকের সংঘর্ষের জন্য বাংলার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কিছুটা ঘাটতি দেখা দেয় । তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে তিনটি দেশি প্রধান ভূমিকা পালন করত ইংরাজ, ফরাসি, ওলন্দাজ। এরা প্রত্যেকেই নিজস্ব জিনিস নিয়ে বাংলার বাজারে আসতো এবং এখানে এসে বসতি স্থাপনের সাথে সাথে নিজস্ব একটি করে বণিক গোষ্ঠীও গড়ে তুলেছে।